পরিচিতি কী, এবং তা কত পুরনো ধারণা? বলা বাহুল্য, এই ধারণা অনড়, অপরিবর্তনীয় নয়। ভৌগোলিক এলাকার ধারণা ও সংজ্ঞা প্রাকৃতিক লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত হতে পারে, আবার রাজনৈতিক মাত্রা দ্বারাও নির্ধারিত হতে পারে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পূর্বের ভারত বলতে যা বোঝায়, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট থেকে তা বোঝায় না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি মেনে যে ভূখণ্ডকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাক-ভারত উপমহাদেশ বলা হত, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব ও অস্তিত্ব সেই সংজ্ঞাতে আবার বদল এনে দেয়। এখন ভারতীয় উপমহাদেশ কথাটি অবিভক্ত ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় ভূখণ্ডের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত। একটি সুপরিচিত ভৌগোলিক এলাকা হিসেবে এই ভূখণ্ডের প্রাচীন পরিচিতি কী কী? এইসব ভৌগোলিক নাম বা সংজ্ঞার উৎসই বা কী? এইগুলিও ইতিহাসের বিবেচনাধীন বিষয়। একটি তুলনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। বর্তমানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রমুখ অঞ্চল জাতিরাষ্ট্র হিসেবে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের অভিঘাতে উদ্ভূত হয়েছে; কিন্তু প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বে ওই এলাকাগুলিতে মনুষ্যবসতির নজির থাকলেও দেশ (country) অর্থে তাদের কোনও ইতিহাসাশ্রয়ী পরিচিতি নেই। ভারতবর্ষে দেশত্ববোধক (দেশাত্মবোধক থেকে পৃথক) ধারণা সুপ্রাচীন আমল থেকেই গড়ে উঠেছে। বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার।

'ভারতবর্ষ' নামটির পূর্বভাগে যে 'ভারত' শব্দটি রয়েছে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "ভরতের বংশধর"। একটি জনগোষ্ঠী বা কৌম (tribe) হিসেবে 'ভরত' নামটি *ঋগ্বেদে* উপস্থিত (বিশদ আলোচনার জন্য তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। একটি এলাকা রূপে 'ভারতবর্ষ' নামটি সম্ভবত প্রথম প্রযুক্ত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ ভাগে উৎকীর্ণ খারবেলের হাতিগুম্ফা প্রশস্তিতে—সেখানে নামটি প্রাকৃতে 'ভরধবস'। কিন্তু খারবেল এলাকা হিসেবে ভরধবসকে আলাদা করেছেন মগধ ও মথুরা থেকে। অর্থাৎ কলিঙ্গরাজের দৃষ্টিতে ভরধবস বা ভারবর্ষ সমগ্র উপমহাদেশ নয়, তা বোঝাচ্ছে মগধ ও মথুরার অন্তবর্তী গাঙ্গেয় উপত্যকাকে। অন্তত চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে ভারতবর্ষ বলতে যে আসমুদ্র হিমাচল এক বিশাল ভূখণ্ডের সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে, তার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য রয়েছে *বিষ্ণুপুরাণে*। সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত যে বর্ষ বা দেশ, তার নাম ভারতবর্ষ (*বর্ষংতদ্ভারতনাম*); কারণ এই ভূখণ্ডে বাস করেন ভরতের উত্তরসূরীবৃন্দ (*ভারতী*)। একটি স্পষ্ট ভৌগোলিক সংজ্ঞা ও পরিচিতি

এক্ষেত্রে স্পষ্ট প্রতীয়মান। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে যে শব্দ গাঙ্গেয় উপত্যকার কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে বোঝাত, তা আরও চার শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র উপমহাদেশের সমার্থক হয়ে দেখা দিল। দশম শতকের মধ্যভাগে সোমদেবসূরি তাঁর *নীতিবাক্যামৃতম্* গ্রন্থের একেবারে অন্তিম শ্লোকে রাজা প্রজা নির্বিশেষে সকল ভারতীয় ব্যক্তির (*রাজানঃ প্রজাশ্চ ভারতীয়াঃ*) জয়লাভ কামনা করেছেন। যদি এটি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক না হয় তাহলে ভারতবাসী অর্থে *ভারতীয়াঃ* শব্দের এটিই প্রাচীনতম প্রয়োগ। স্পষ্ট করে বলা ভাল, এই শব্দ কখনওই জাতি বা নেশন (nation) অর্থে অথবা জাতিরাষ্ট্রের নাগরিক অর্থে ব্যবহার করা হয় নি।

অপর যে নামটি উপমহাদেশ বোঝাতে ব্যবহৃত, তা হল জম্বুদ্বীপ। শব্দটির প্রথম প্রয়োগ দেখা যাবে অশোকের একটি অনুশাসনে (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য), যেখানে জম্বুদ্বীপ প্রকৃতপক্ষে মৌর্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে অভিন্ন। অর্থাৎ অশোক শব্দটিকে কেবল একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞায় চিহ্নিত করেন নি, তার সঙ্গে একটি রাজনৈতিক মাত্রাও জুড়ে দিয়েছিলেন। পুরাণের বর্ণনা ও কল্পনায় পৃথিবীতে বিরাজ করে সাতটি দ্বীপ (*সপ্তদ্বীপা বসুমতী*)। এই দ্বীপের অন্যতম জম্বুদ্বীপ, যার বর্ণনায় পুরাণসুলভ অতিকথার মিশেল দেখা যাবে। পুরাণকাররা কখনও কখনও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনও কোনও অঞ্চলকে জম্বুদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই বর্ণনার কোনও রাজনৈতিক মাত্রা নেই। ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে দীর্ঘকালীন বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিল, তারই দরুন পুরাণকাররা এই অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ভৌগোলিক বিচারে এই অন্তর্ভুক্তি প্রমাদপূর্ণ।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উপমহাদেশের বিবিধ প্রকার ভৌগোলিক বিভাজন দেখা যায়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য পাঁচ ভাগে এই ভূখণ্ডকে বিভাজনের ধারণা, যার প্রথম প্রকাশ *ঐতরেয় ব্রাহ্মণে* (তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত)। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—এই চার দিকের চার বিভাগ ছাড়াও ছিল একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল, যা কালক্রমে—বিশেষত *মনুসংহিতায়*—মধ্যদেশ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এই মধ্যদেশের অবস্থান গাঙ্গেয় সমভূমিতে—পশ্চিমে হরিয়ানা থেকে পূর্বে এলাহাবাদ পর্যন্ত (অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের পূর্বপ্রান্ত অবধি), যদিও মধ্যদেশের পূর্ব সীমানাকে ক্রমান্বয়ে পূর্বদিকে বিস্তৃত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র উত্তর ভারত *মনুসংহিতায়* আর্যাবর্ত নামে অভিহিত, যার অবস্থান পশ্চিম ও পূর্ব সমুদ্রের মধ্যে এবং হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের অন্তবর্তী ভূখণ্ডে। সপ্তম শতক নাগাদ আর্যাবর্তের সমার্থক শব্দ হিসেবে 'উত্তরাপথ' কথাটিও সমগ্র উত্তরভারত অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। হর্ষবর্ধনের *সকলোত্তরাপথনাথ* অভিধাটি এই প্রেক্ষিত থেকে বিচার্য। বুঝতে অসুবিধা হয় না 'উত্তরাপথ' কথাটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে উত্তরদিকের বাণিজ্যপথের নামানুসারে সৃষ্ট হয়েছিল। মধ্যদেশের উত্তরসীমা থেকে উত্তরাপথের সূচনা হওয়া উচিত। সেই কারণে

রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে উত্তরাপথের সূচনা নির্দেশ করেছিলেন পৃথূদক বা হরিয়ানার পেহোয়া থেকে (*ততঃ পৃথূদকাৎ পরতঃ উত্তরাপথ*)। উত্তরাপথের মতোই দক্ষিণাপথ নামক সুপরিচিত এলাকাটিও দক্ষিণদিকের কোনও প্রাচীন পথের স্মৃতি বহন করে। উত্তর ভারত ও দক্ষিণাপথের সীমানা চিহ্নিত করে দেয় বিন্ধ্য পর্বত। পুরাণে অবশ্য এই সীমারেখা হিসেবে নর্মদা নদীকেও বিবেচনা করা হয়েছে। তার যাথার্থ্য স্বীকার করতে হয়, কারণ নর্মদা বিন্ধ্যের প্রায় সমান্তরালভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত। এই বিভাজন রেখার স্বীকৃতি দিয়েছেন *পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী*-র অজ্ঞাতনামা গ্রিক লেখকও। *নামাডোস* (Namados) বা নর্মদার দক্ষিণস্থ ভূভাগকে তিনি সঠিক চিহ্নিত করেছিলেন *দাখিনাবাদেস* (Dachinabades) নামে; *দাখিন* (Dachin) শব্দটি যে স্থানীয় ভাষায় দক্ষিণ-এর সমার্থক, তা-ও তিনি অবগত ছিলেন। তাঁর *দাখিনাবাদেস* নিঃসন্দেহে দক্ষিণাপথের সঙ্গে অভিন্ন। দক্ষিণাপথের দক্ষিণ সীমা—অধিকাংশ ভারতীয় সাহিত্য অনুসারে—সেতু (রামেশ্বর) বা কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু ভিন্নতর সংজ্ঞায় কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ এলাকাকে দ্রাবিড় অঞ্চল বলে চিহ্নিত করার প্রবণতাও ছিল। *পেরিপ্লাসের* অনামা লেখক ও ক্লডিয়াস টলেমি যখন *দ্যামিরিকা* বা *লিমুরিকে* নামক সুদূর দক্ষিণ ভারতীয় এলাকার উল্লেখ করেন, তখন তা *দাখিনাবাদেস* বা দক্ষিণাপথ থেকে পৃথক্। *দ্যামিরিকা* বা *লিমুরিকে* এই গ্রিক নামের উৎস 'দ্রাবিড়' শব্দটি।

সুদূর দক্ষিণ ভারত—যা দ্রাবিড় দেশ বলে অভিহিত—বলতে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ এলাকাকে বোঝায়। তামিল সঙ্গম সাহিত্যে তামিলকম্ অঞ্চলে পাঁচটি আঞ্চলিক বিভাজনের ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। মুল্লাই (গোচারণ ভূমি), কুরিঞ্জি (পার্বত্য এলাকা), মরুদম্ (সমভূমি), নেইদল (তটীয় এলাকা), পালৈ (শুষ্ক তৃণাঞ্চল)—এই প্রকার বিভাজন করা হয়েছিল পরিবেশগত বৈচিত্র্য অনুসারে। ভৌগোলিক এলাকা চিহ্নিত করার জন্য পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে সুদূর দক্ষিণ ভারতের ভৌগোলিক পরিচয় অনেকাংশেই নদী-উপত্যকার দ্বারা চিহ্নিত। বর্তমান তামিলনাড়ুর উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত এলাকাটি তোণ্ডইমণ্ডলম্, যা উত্তরে পেন্নার নদী থেকে দক্ষিণে আর্কট জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। আরও দক্ষিণে কাবেরী উপত্যকা ও বদ্বীপকে আশ্রয় করে দেখা দিল চোলমণ্ডলম্, যে নাম থেকে বর্তমান কোরমণ্ডল নামটির উৎপত্তি। দক্ষিণতম অংশে রয়েছে পাণ্ড্যমণ্ডলম্, যা প্রধানত বৈগাই, তাম্রপর্ণী নদীর উপত্যকা এবং বদ্বীপ এলাকা নিয়ে গঠিত। তামিলনাড়ুর পশ্চিমভাগ যা বর্তমান কেরলের সংলগ্ন, তা কোঙ্গুদেশ বলে পরিচিত।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই নদীগুলির জীবনদায়িনী ভূমিকা ভারতীয় সাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। তার সূচনা *ঋগ্বেদের* বিখ্যাত *নদীস্তুতিতে* পাওয়া যায়। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী,

নর্মদা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীগুলি পুণ্যতোয়া তো বটেই, বহুক্ষেত্রে দেবত্বেও উন্নীত। পুরাণের বর্ণনায় ভারতের প্রধান প্রধান নদী উল্লিখিত হয়েছে। বিশেষ লক্ষণীয় হল প্রধান নদীগুলি পুরাণে তাদের আপন আপন পার্বত্য উৎস দ্বারা চিহ্নিত। গঙ্গা যেমন হিমালয় থেকে উদ্গত, তেমনই নর্মদার পরিচিতি মেকল পর্বতের কন্যারূপে (মেকলসূতা)। পুরাণকাররা এইভাবে নদী ও পর্বতগুলির ওতপ্রোত সম্পর্ক চিহ্নিত করেছিলেন। বিস্ময়কর ঘটনা যে দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে টলেমির ভূগোলেও অধিকাংশ প্রধান ভারতীয় নদী তাদের পার্বত্য উৎস সহ উল্লিখিত। দুই ভিন্ন প্রকার রচনার মধ্যে শুধুমাত্র বিবরণের মিল নয়, পদ্ধতিগত সাদৃশ্যও রীতিমতো চমকপ্রদ। নদীগুলি জলজ প্রাণির কারণে সুদূর অতীত থেকে শিকারী, পশুপালক গোষ্ঠীর জীবনধারণে অমূল্য ভূমিকা নিয়েছে। কৃষিজীবী সমাজের জন্য নদীমাতৃক এলাকার তাৎপর্য বুঝতে কষ্ট হয় না। বহু নদীর তীরেই গড়ে উঠেছিল নানা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও তীর্থ, যা ছিল নানা মানুষের মিলনস্থল।

এই উপমহাদেশ যেহেতু অন্যান্য প্রতিবেশী এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না, যেহেতু বহির্ভারতীয় নানা এলাকার মানুষ উপমহাদেশে এসেছেন, ফলে উপমহাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি ও ধারণা বিদেশীদের জবানবন্দিতেও উপস্থিত। বৈদেশিক বিবরণে উপমহাদেশ মূলত তিনটি নামে পরিচিত ছিল—ইণ্ডিয়া, হিন্দুস্থান এবং শেন-দু/Shen-du (শেন-তু)। এই অভিধাগুলির সংজ্ঞা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল সে বিষয়ে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ইণ্ডিয়া নামটির প্রথম ব্যবহার করেছিলেন হেরোডোটাস, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে। তিনি উপমহাদেশে কখনও না এলেও উপমহাদেশ সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করেছিলেন পারসিক সূত্র থেকে; সেখানেই এই নামকরণের চাবিকাঠি রয়েছে। হখামনীষীয় দরায়বৌষ যখন নিম্ন সিন্ধু এলাকা ও সিন্ধু বদ্বীপ সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ জয় করেন তখন নিম্ন সিন্ধু এলাকা ও বদ্বীপ অঞ্চল পারসিক সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ স্যাট্রাপি-তে (Satrapy) পর্যবসিত হয়, তার নাম হয় হিদুষ (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইরানীয় ভাষায় 'স'-এর উচ্চারণ নেই, তার বিকল্প হল 'হ'। ফলে, যে অঞ্চল সিন্ধু নদ বিধৌত হওয়ার দরুন সিন্ধু বলে পরিচিত ছিল (তুলনীয় বৈদিক সাহিত্যে *সপ্তসিন্ধব*; চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তা-ই ইরানীয় লেখতে দেখা দেয় হিদুষ নামে। গ্রিক ভাষায় 'হ' (h)-এর উচ্চারণ অনুপস্থিত, তার বিকল্প 'ই' (i); অতএব যা ছিল সিন্ধু-হিদুষ, তা গ্রিক বিবরণে 'ইণ্ডিয়া' নাম ধারণ করে। খেয়াল রাখা দরকার, আদিমতম বিবরণে ইণ্ডিয়া শব্দটি কেবলমাত্র নিম্ন সিন্ধু এলাকা ও সিন্ধু বদ্বীপকে বোঝাত। তা কখনও উপমহাদেশের সমার্থক ছিল না। এর পর আলেকজাণ্ডারের অভিযান, মৌর্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে সেলিউকীয় শাসকদের ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে

উত্তরোত্তর বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ফলে উপমহাদেশ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হতে থাকে। মেগাস্থিনিস, ডিওডোরাস, স্ট্রাবো, আরিয়ান প্রমুখের বিবরণ পড়লে কোনও দ্বিমত থাকে না যে পরবর্তীকালে ইণ্ডিয়া বলতে সমগ্র উপমহাদেশকেই বোঝানো হয়েছে। এই বিশাল ভূখণ্ডের উত্তরে হিমালয় (Imaos) ও দক্ষিণে সমুদ্র—এই মুখ্য দুই চিহ্ন সম্বন্ধে গ্রিক লেখকরা যথেষ্ট সচেতন। যেহেতু তাঁরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনে যান নি, ফলে উপমহাদেশের পূর্বসীমা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অস্পষ্ট। উপমহাদেশের বিশালত্ব নিয়ে গ্রিক লেখকরা সম্যক অবহিত থাকলেও উপমহাদেশের আকার সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ঠিক ছিল না। তাই তাঁদের বর্ণনায় উপমহাদেশ কখনও আয়তাকার, কখনও বর্গাকার, কখনও বা রম্বাস-সদৃশ (rhombus shaped)—উপমহাদেশের ত্রিকোণাকৃতি গড়ন তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন নি। উপমহাদেশের মানচিত্র তৈরি করতে গিয়ে সবচেয়ে বিকৃতি ঘটিয়েছিলেন টলেমি তাঁর ভূগোল গ্রন্থ *জিওগ্রাফিকে হফেগেসিস*-এ (*Geographike Huphegesis*)। সরেজমিনে উপমহাদেশে ভ্রমণ না করার সুবাদেই সম্ভবত এই প্রকার ত্রুটি গ্রিক বিবরণীতে ঘটেছিল।

অবশ্য পুরাণকাররাও এই দোষ থেকে মুক্ত নন। কখনও তাঁরা ভারতের পদ্মফুলসদৃশ (কমলাকার), কখনও কচ্ছপসদৃশ (কূর্মাকার), কখনও শকট আকারের উল্লেখ করেছেন। এই কারণে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন পৌরাণিক বর্ণনায় ভৌগোলিককে হঠিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে কবির কল্পনা। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ অবশ্য উপমহাদেশের ত্রিকোণাকার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন (*ভারতবর্ষস্ত্রিকোণঃ*)। উপমহাদেশের ধনুকাকৃতি বর্ণনাতেও হয়তো বাস্তবের ছোঁয়া আছে।

বিদেশী তথ্যসূত্রে উপমহাদেশের অপর নাম হিন্দুস্তান। বহু প্রচলিত ধারণা হিন্দুস্তান নামটি মুসলমান লেখকরা দিয়েছিলেন, যাঁরা উপমহাদেশকে মূলত হিন্দুদের দেশ বলে বিচার করতেন। এই মত ভ্রান্ত। আরবী-ফার্সী রচনায় হিন্দুস্তান নামক দেশের প্রসঙ্গ বহুবার এলেও এই নামকরণের নেপথ্যে কোনও ধর্মীয় উপাদান নেই। নামটির প্রাচীনতম প্রয়োগ দেখা যাবে ২৬২ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ সাসানীয় শাসক প্রথম শাহ্‌পুর-এর *নক্‌শ-ই-রুস্তম্‌* লেখতে। সাসানীয় শাসক দ্বারা বিজিত এলাকাগুলির অন্যতম ছিল হিন্দুস্তান। লেখটি তিনটি ভাষায় রচিত—ইরানীয়, পহ্লবী এবং গ্রিক। হিন্দুস্তানের সমার্থক গ্রিক ও পহ্লবী শব্দ দুইটি হল 'ইণ্ডিয়া' ও 'হেন্দি'। শাহপুর কুষাণ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন এবং ওই ইরানীয় শাসক কোনওক্রমেই উপমহাদেশের বৃহদাংশ জয় করেন নি। তাঁর অধীনস্থ এলাকাগুলির নাম হিন্দুস্তানের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় হিন্দুস্তান কার্যত নিম্নসিন্ধু এলাকা ও সিন্ধু বদ্বীপের সমার্থক। অর্থাৎ গ্রিক ইণ্ডিয়া-র মতোই হিন্দুস্তান শব্দটির উৎপত্তি নিম্ন সিন্ধু উপত্যকাকে ভিত্তি করে। ২৬২ খ্রিস্টাব্দে এই নামটি যখন প্রথম

প্রযুক্ত হল, তখন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনই হয় নি। পরবর্তীকালে আরবী-ফার্সী লেখকরা হিন্দুস্তান নামটির বহুল প্রয়োগ করেছেন, এবং সমগ্র উপমহাদেশ বোঝাতেই তা করেছেন। দশম শতকের শেষ ভাগে (৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *হুদুদ অল্ আলম্*-এ 'হিন্দুস্তান' শব্দ দ্বারা সমগ্র উপমহাদেশই চিহ্নিত। হিন্দুস্তানের পশ্চিম সীমায় মিরহান নদী (সিন্ধু), পূর্বে কামারুন (কামরূপ), উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত তার বিস্তার। তবে আরবী-ফার্সী লেখকরা কখনও কখনও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অঞ্চলবিশেষকে হিন্দুস্তানের অন্তর্গত বলে নির্দেশ করেছেন, যা অবশ্যই ভুল।

তৃতীয় বৈদেশিক নাম শেন-দু এসেছে চীনা তথ্যসূত্র থেকে। হান বংশীয় দলিলের ভিত্তিতে বলা যায় যে এই নামের উল্লেখ করেন ঝাং কিয়ান/Zhang Qian (চাং কিয়েন) যিনি হান বংশীয় দূত হিসেবে ব্যাক্ট্রিয়া বা বালখ্ (বর্তমান আফগানিস্তানের মজর-ই-শরিফ এলাকা) দেশে আসেন। ওই অঞ্চল সহ সন্নিহিত এলাকাগুলির বিবরণ প্রসঙ্গে ব্যাক্ট্রিয়া ও গন্ধার এলাকার দক্ষিণে শেন-দু নামক এক অঞ্চলের উল্লেখ তিনি করেছেন, যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে একই নামের এক নদী (অর্থাৎ শেন-দু) প্রবহমান; অঞ্চলটির দক্ষিণতম প্রান্তে সমুদ্র অবস্থিত। শেন-দু নামক নদীটি নিঃসন্দেহে সিন্ধু নদের চৈনিক রূপ; এই নদী বিধৌত এলাকা, যা সমুদ্র সংলগ্নও বটে, তাকে নিম্ন সিন্ধু এলাকা ও সিন্ধু বদ্বীপের সঙ্গে তুলনা করাই শ্রেয়। বিশেষ লক্ষণীয়, উপমহাদেশের তিন তিনটি বিদেশী নামের উৎস কিন্তু এক ও অভিন্ন অঞ্চল থেকে—নিম্ন সিন্ধু এলাকা ও সিন্ধু বদ্বীপ অঞ্চল। পরবর্তী চৈনিক বিবরণীতে শেন-দু নামটি তিয়ানঝু/Tianzhu (তিয়েন-চু) রূপ ধারণ করে। উপমহাদেশের ভৌগোলিক বিবরণের জন্য চীনা পর্যটক সুয়ান জাং/Xuan Zang-এর (হিউয়েন সাঙ) রচনা উপযোগিতায় অনতিক্রান্ত। তিনি অবশ্য তিয়ানঝু ছাড়াও উপমহাদেশকে ইন-তু নামে অভিহিত করেছেন। তার বিবরণ অনুযায়ী উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমা নির্দেশ করছে লম্পাক (আফগানিস্তানের লামঘান অঞ্চল), যেখান দিয়ে তিনি উপমহাদেশে প্রবেশ করেন ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে নির্গতও হয়েছিলেন। তিনি যেহেতু প্রায় সমগ্র উপমহাদেশ—পূর্বে কামরূপ, দক্ষিণে কাঞ্চী এবং পশ্চিমে সুরাষ্ট্র পর্যন্ত—পরিভ্রমণ করেছিলেন, তাঁর রচনা ভৌগোলিক বিবরণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তিনি তিয়ানঝু ও ইন-তু বলতে সমগ্র উপমহাদেশকে নিঃসন্দেহে নির্দেশ করেছিলেন। শেন-দু/ তিয়ানঝু নামটি ইণ্ডিয়া ও হিন্দুস্তানের মতোই নিম্ন সিন্ধু এলাকা থেকে কালক্রমে সমগ্র উপমহাদেশে ব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু চীনা বিবরণীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূখণ্ডকে উপমহাদেশের অন্তর্গত করে দেওয়ার ভ্রান্তি দেখা যায় না।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা হল তার মূল প্রতিপাদ্য এই যে, এই উপমহাদেশ সম্বন্ধে দেশীয় ও বহিরাগত লেখকদের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ধারণা ছিল। ভারতবর্ষ,

জম্বুদ্বীপ, ইণ্ডিয়া, হিন্দুস্তান, শেন-দু/তিয়ানঝু প্রভৃতি শব্দ দ্বারা আসমুদ্র হিমাচল এক বিশাল ভূখণ্ডকে নির্দেশ করা হত একটি সুচিহ্নিত ভৌগোলিক এলাকা (country) হিসেবে। এই ধারণার সঙ্গে অবশ্য ঐক্যবদ্ধ, একীকৃত ভারতবর্ষ নামক এক জাতিরাষ্ট্রের (Nation State) প্রকল্প—যা বিগত কয়েক দশকে 'অখণ্ড ভারত' বলে প্রচারিত হচ্ছে—কখনও সমার্থক নয়। প্রাচীন লেখকরা এই উপমহাদেশের বিশালত্ব সম্বন্ধে যেমন সচেতন, তেমনই তাঁরা ওয়াকিবহাল ছিলেন তার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বিষয়ে। এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্য যে অনেকটাই ভৌগোলিক উপাদানের থেকে উদ্ভূত, তাতে সন্দেহ নেই। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের সমাহার ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অনেকান্তিক চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে বিশেষ সহায়ক ছিল।

ভারতীয় ইতিহাসের অনেকান্তিক চরিত্রের কথা বললে স্বাভাবিকভাবেই তার পরিবর্তনশীল চরিত্রকেও মেনে নিতে হয়। এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান লক্ষণ কালগত বদল। ভারতের অতীতচিন্তায় কালগত ধারণা কেমন ছিল, ভারতীয় ইতিহাসে পরিবর্তনের নিরিখ হিসাবে কী কী ভাবে যুগবিভাগ করা যায়—এই প্রশ্নগুলিও কম জরুরি নয়।

আধুনিক রীতিসম্মত ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় যুগবিভাগের ধারণাটি পাশ্চাত্য থেকে আহৃত। উনবিংশ শতকে উপযোগিতাবাদী মতাদর্শে চালিত হয়ে জেমস মিল যে ভারত-ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে তিনি হিন্দু, মুসলমান এবং ব্রিটিশ (বিশেষ লক্ষণীয়, খ্রিস্টান নয়) যুগ—এই তিন কালগত বিভাজন লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মিলের প্রাথমিক ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাগসর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভূতপূর্ব যুগগুলির—বিশেষত মুসলমান শাসনাধীন পর্বটির—তুলনায় কত ব্যাপক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় প্রগতি ঘটেছিল, তা প্রতিপন্ন করা। তাঁর বিচারে স্বভাবতই প্রথম দুইটি যুগ ভারতের পশ্চাদ্মুখীনতার সাক্ষ্য বহন করে। মিলের এই ধারণা বহু সমালোচিত। তাঁর যুগবিভাগ সংক্রান্ত প্রকল্পটিও ধর্মসাম্প্রদায়িক অভিসন্ধির পরিচয় দেয়। এই যুগবিভাগ পদ্ধতির অসারতা প্রতিপন্ন করা হলেও হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ প্রভৃতি বাক্যবন্ধ এখনও শোনা যায়। এই জাতীয় যুগবিভাগ করার পিছনে যে ধারণাটি দৃঢ়বদ্ধ, তা হল শাসকের বা শাসকবংশের ধর্মই আপামর জনসাধারণ বা প্রজা তথা শাসিতের ধর্ম। শাসকের ধর্মমতের বা ধর্মবিশ্বাসের মাপকাঠিতে ইতিহাসের কালপর্যায় নির্দেশ করা শুধু পদ্ধতিগতভাবে ভুল তা-ই নয়, তার তথ্যগত ভিত্তি নেই, এবং এই জাতীয় ধারণা বিপজ্জনক মানসিকতার জন্ম দেয়। ইউরোপীয় ইতিহাসে খ্রিস্টধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শাসক ও শাসিতের ধর্মবিশ্বাসে যে সামগ্রিক সাযুজ্য বিদ্যমান, তার অনুরূপ ছক ভারত-ইতিহাসে কখনও নেই। হিন্দু বলে যে ধর্মটির কথা এখন বলা হয়, তেমন কোনও ধর্মমতের উল্লেখ প্রাক-১৩০০ খ্রিস্টাব্দ তথ্যসূত্রে নেই। ফলে প্রাক-১৩০০ খ্রিস্টাব্দ